ফগ সাহেবের অভিশাপ

ইশতিয়াক হাসান

ফগ সাহেবের অভিশাপ

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

উৎসর্গ

সাদা মনের রোমাঞ্চপ্রিয় দুই মানুষ
ডা. মিনহাজ আহমেদ ও ইবাদুল হক

রাত নেমেছে পাহাড়-চা বাগানের রাজ্যে। মাঝারি আকারের একটা টিলার ওপর ছোট্ট এক বাংলো। ইটের দেওয়াল আর টিনের চালার বাংলোটিতে শোবার ঘর একটাই। কামরাটির দুই পাশে দুটি বিছানা। অন্ধকারে মিটমিট করে জ্বলছে মেঝেতে রাখা একটা হারিকেন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল প্রিন্সের। একবার তাকাল পাশের খাটটির দিকে। মামণি ঘুমাচ্ছেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু ঘুম ভাঙল কেন ওর? নিজেকেই জিজ্ঞেস করল প্রিন্স। তারপরই কারণটা বুঝতে পেরে শিউরে উঠল। অদ্ভুত একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। তবে পুরোপুরি একে ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। কিছুটা পশুর গর্জনের মতো। তবে কেমন বিকৃত। মনে হয় যেন যে ডাকছে তার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। এমন শব্দ কোন প্রাণী করে এটা চিন্তা করে কূল-কিনারা পেল না। ওটা আসছে বাংলোর পেছন দিক থেকে।

তারপরই মনে হলো কোনো অশরীরীর ডাক না তো। এমন জঙ্গুলে এলাকায় কত কিছুই তো থাকতে পারে। তা ছাড়া মামণির সঙ্গে নানা দুর্গম জায়গায় গিয়ে বুঝেছে প্রকৃতির গুপ্ত কুঠুরিতে বিচিত্র অনেক কিছুই লুকানো আছে।

এই শব্দটা বাদে চারপাশে মৃত্যু-নীরবতা। তাই ওটা কানে বাজছে বড়ো। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি থেমে গেল ওটা

আকস্মিকভাবেই। এক মিনিটের নীরবতা। তবে প্রিন্সের মনে হলো এটা এক ঘণ্টা। তারপর আবার হলো। তবে এবার অন্যরকম একটা আওয়াজ। কোনো কিছুর শরীর ঘষটে এগিয়ে আসার। আঁতকে উঠল ও। এটা এখন খুব কাছে, ঠিক তার জানালাটার পেছন থেকে আসছে।

মামণির দিকে আবার তাকাল। ডাকবে? সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। মা ওকে ভীতু ভাবুন চায় না। এমনিতেই বলেন প্রিন্স মোটেই তার মতো হয়নি। মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে না। এখন আবার যদি মা ওকে ভীতু ভেবে বসেন!

আবার থেমে গেছে শব্দটা। দুই খাটের পেছনেই বড়ো বড়ো দুটি জানালা। পাল্লা বন্ধ। কাজেই বাইরে যা-ই থাকুক ভেতরে ঢুকতে পারবে না। অবশ্য অশরীরী হলে আলাদা কথা। তবু কেমন অস্থির লাগছে ওর।

আবার শোনা গেল। এবার চাপা ঘড়ঘড় একটা শব্দ। একই সঙ্গে ঘষটানোর আওয়াজ। ঠিক জানালার পেছনেই।

সন্ধ্যার ঠিক আগে এখানে পৌঁছায় ওরা মা-ছেলে ঘুরে দেখতে পারেনি জায়গাটা। বাংলোর পেছনের পাহাড়ে জঙ্গল আছে কি না তাও জানে না।

এবার সাহস করে খাটের ওপরে বসা অবস্থাতেই শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল জানালার সামনে। কাঠের পাল্লার এক ইঞ্চি দূরে এখন ওর মুখটা। কান দুটি সজাগ। তারপরই কর্কশ একটা শব্দ হলো। কাঠের জানালায় ধারালো নখের আঁচড় কাটলে যেমন হওয়ার কথা অনেকটা তেমন।

তার আর জানালার মাঝে ব্যবধান ইঞ্চিখানেক। এদিকে ইঞ্চি দুয়েক পুরু জানালাটা। তার মানে মাত্র তিন ইঞ্চি দূরে হচ্ছে টানা খসখসে শব্দটা। আবারও ওর মনে হলো, রক্তমাংসের কোনো প্রাণী নয় ওটা, অশরীরী। নখের আঁচড়। এবার অনেক তীক্ষ্ণ। না চাইলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না ও। গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো চিৎকার।

৮ নভেম্বর, ২০২৪। বিকাল সাড়ে চারটা। চা-বাগানের মাঝের পথ দিয়ে এগিয়ে চলছে জিপটা। অনেকটা বান্দরবান কিংবা সাজেকের দিকে চলা ছাদখোলা জিপগুলোর সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। তবে আকারে ছোটো। গাঢ় সবুজ রং জিপটার। সামনের সিটে চালকের পাশে বসে মুগ্ধ চোখে দেখছে প্রিন্স। দুই পাশের টিলা-পাহাড়ে চা-গাছের সারি। সবুজ পাহাড়, চা-বাগান দেখতে দেখতে প্রিন্স ভাবছিল, কী হঠাৎ করেই না মামণির সঙ্গে আবার একটা অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ল।

গতকালকের ঘটনা। টানা কিছুদিন ভার্সিটির পরীক্ষায় ডিউটি, খাতা দেখা এসবে ব্যস্ত থাকার পর দুই দিন হলো হাঁপ ছাড়ার সুযোগ মিলেছে নাবিলার। নাবিলা মারজান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারের ডাইনিংরুমে বসে জানালা দিয়ে পাশের আমগাছে বসে থাকা এক জোড়া বসন্তবাউরির দিকে দুজনেরই নজর। সবুজ শরীর, গলার কাছটা নীল আর সিঁদুরে লাল মাথার এই পাখিরা দেখতে ভারি সুন্দর। এ সময়ই বেজে উঠল নাবিলার ফোন। এ পাশের কথা শুনে প্রিন্স যতটা বুঝতে পারল অপর পাশের ব্যক্তিটি মামণির বন্ধু সিলেটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মিজানুর রহমান।

মৌলভীবাজারের পুঁটিছড়া নামে কোনো একটি জায়গায় রহস্যময় একটা প্রাণী কিংবা কিছুর আক্রমণ হচ্ছে। বন বিভাগের অফিসের পাশে একটা গ্রামই এর লক্ষ্যবস্তু। ওই গ্রামের মানুষ তো বটেই বন বিভাগের কর্মীরাও আতঙ্কে আছে। এদিকে ওর মামণির কাজ হচ্ছে রহস্যময় কিংবা ব্যাখ্যার অতীত কিছুর সন্ধান পেলেই বেরিয়ে পড়া। সেটা দুর্গম কোনো পাহাড়-জঙ্গল হোক কি কোনো অজপাড়াগাঁ!

তবে ঘটনাটার মধ্যে আরও কোনো রহস্য আছে। তা না হলে নাবিলা সঙ্গে সঙ্গে পুঁটিছড়া আসতে রাজি হতেন না। এর দুই দিন পরই ওরা ট্রেনে চলে আসে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া। সেখানে বন বিভাগের অফিসে দুপুরের খাওয়াদাওয়া আর একটু বিশ্রামের পর এখন চলছে পুঁটিছড়ার দিকে।

প্রিন্সও চিন্তার জাল ছিন্ন করে চলে এলো বর্তমানে। দুই পাশে যতদূর চোখ যায় গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটার পর একটা ছোটো টিলা। ওগুলোতে চা-গাছ। তবে এর মধ্যেই আবার দু-একটি টিলা চোখে পড়ছে যেখানে আগাছা আর জংলি ঝোপ-ঝাড়ের রাজত্ব। মাঝেমধ্যে এগুলোর ফাঁক গলে চোখে পড়ে দু-একটা চা-গাছ।

প্রিন্সকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ড্রাইভার হাসান বলল, ‘এটা রত্না চা-বাগান। খুব পুরানো একটা চা-বাগান। আহ কী স্বাদ এখানকার চায়ের। তবে মাঝখানে বছর কয়েক বন্ধ ছিল বাগানটা। পরে আবার চালু হইসে। কিন্তু সবগুলো টিলায় এখনো নতুনভাবে বাগান করা হয়নি।’

‘জানিস প্রিন্স, বাংলাদেশে যা চা-বাগান আছে তার অর্ধেকের বেশি আছে এই মৌলভীবাজার জেলায়। এখানকার কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, জুড়ী, কুলাউড়া, রাজনগর, বড়লেখা এসব উপজেলায় অনেক চা-বাগান আছে।’

‘তা হলে তো আমরা চা-বাগানের রাজ্যে চলে এসেছি বললে ভুল হবে না।’ ফোড়ন কাটল প্রিন্স।

‘তা ঠিক বলেছিস। মজার ঘটনা চা আবিষ্কারের বিষয়টা অনেকটা একসিডেন্টাল। কিংবদন্তি অনুসারে চা প্রথম আবিষ্কার করেন চীনা

সম্রাট শেন নাং। সেটা খ্রিস্টপূর্ব ২৩৩৭ সালে। মানে পৌনে পাঁচ হাজার বছর আগের ঘটনা। ওই সময় তাঁর গরম পানিতে বুনোগাছের কিছু পাতা পড়ে। তিনি যেটা পান করলেন সেটাই চা। এখন তো পৃথিবীর ৫০টির বেশি দেশে চা জন্মে।'

কথা বলার ফাঁকেই চা-বাগান বিদায় নিল, গাড়িটা এসে দাঁড়াল একটা ছোটো পাহাড় কিংবা টিলার নিচে।

'ম্যাডাম আমরা পৌঁছায় গেসি।' সামনে থেকে হাঁক দিলো হাসান মিয়া।

লাফ দিয়ে নামল প্রিন্স। ততক্ষণে পেছন থেকে নেমে এসেছেন নাবিলা এবং রাইফেলধারী একজন বনপ্রহরী।

মায়ের দিকে তাকাল প্রিন্স। একই সঙ্গে গর্ব আর লজ্জা দুটোই হলো ওর। মামণির বয়স সাঁইত্রিশ, ওর পনেরো। তবে কেউই নাবিলার বয়স ৩০-৩২-এর বেশি ভাববে না। ফরসা, একটু লম্বাটে মুখ। বড়ো বড়ো চোখে ধারালো দৃষ্টি। তবে চালচলনে একটা ছটফটে ভাব আছে। চোখের চশমাটা না থাকলে অধ্যাপিকার থেকে সাংবাদিক কিংবা অ্যাথলেট হিসেবেই মনে হয় মানাত বেশি। অনেকেই নাবিলাকে প্রিন্সের বড়ো বোন মনে করে।

প্রিন্স ক্লাস টেনে পড়ে। লম্বায় মাকে ছাড়িয়ে গেছে এর মধ্যেই। নাবিলা সাড়ে পাঁচ ফুট, ও পাঁচ ফুট সাত। বাবার গায়ের রং পেয়েছে, শ্যামলা।

'ম্যাডাম টিলার উপরে ছোট্ট একটা বাংলোমতো আছে। আপনারা যে কয়টা দিন থাকবেন এখানেই থাকতে হবে। একটু কষ্ট হবে। কিন্তু...' বলল হাসান।

'অসুবিধা নেই। রেঞ্জার সাহেব আমাকে বলেছেন। আর এ রকম কষ্ট করা আমার ও আমার ছেলের দুজনেরই অভ্যাস আছে।' তারপর প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী পারবি না?'

'হুঁ।' এক শব্দে উত্তর দিলো প্রিন্স।

ওর কথা বলতে যে ইচ্ছা করে না তা নয়। কিন্তু চাইলেও সবার সঙ্গে মিশতে পারে না। আসলে ও ওর বাবা-মা দুজন থেকেই কিছু কিছু জিনিস পেয়েছে। বাবা শান্ত, কথা কম বলতে পছন্দ করেন। অবশ্য ফোনে নিয়মিত কথা হলেও বছরে এক-দুই বারের বেশি বাবার সঙ্গে দেখাই হয় না ওর। প্রিন্সের বাবা নামকরা বিজ্ঞানী। থাকেন আমেরিকায়। মামণি কোনোভাবেই দেশ ছাড়তে রাজি হননি। প্রিন্সও তার সঙ্গেই রয়ে গেছে।

প্রিন্স শান্ত এবং কম মিশুক এটা ঠিক আছে, কিন্তু মায়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার কিংবা রহস্যময় বা অতিপ্রাকৃত ঘটনায় তার ভীষণ আগ্রহ।

টিলার গা বেয়ে এঁকেবেঁকে একটা পথ উঠে গেছে। বনপ্রহরী জোর করে প্রিন্সের ব্যাগটা নিয়ে নিল। নাবিলা অবশ্য কোনোভাবেই তার ব্যাগ দিলো না। প্রিন্সের মনটা ওর বাবার মতোই নরম। পাছে ওরা মন খারাপ করে এ জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যাগটা দিয়েছে।

বাঁশ পেতে চলাচলের সুবিধা করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও প্রিন্সের মনে হলো এর চেয়ে মাটির পথই ভালো ছিল। আরেকটু উপরে উঠতেই বাংলোটা নজরে পড়ল। একসময় টিলাটার উপরে উঠে এলো ছোটো দলটি। ঢালুভাবে ওঠার পর চূড়াটা মোটামুটি সমতল। ডান পাশটায় হালকা জঙ্গল। ছড়ানো-ছিটানো কয়েকটা বড়ো গাছ ও কিছু ফুলের গাছের পরে বাংলোটা।

প্রিন্সের পাহাড় ও ছোট্ট বাংলোটা দেখে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ হলো। সামনের বারান্দাটায় কাঠের দেওয়াল আর তারের জাল। ভেতরে ঢুকে দেখল একটা শোবার ঘর, ছোট্ট একটা ড্রইং কাম ডাইনিং, বাথরুম ও একটা রান্নাঘর।

এ সময়ই বছর পঞ্চাশেকের এক লোক হাজির হলো। চুল আধপাকা, মাঝারি স্বাস্থ্য।

সালাম দিয়ে বলল, 'ম্যাডাম আমি আসাদুল্লাহ। এ বাংলোর কেয়ারটেকার। বাংলোর পেছনের দিকে আমি বউ আর দুইটা মেয়ে নিয়া থাকি। এই কয়দিন আমরাই আপনাদের দেখাশুনা করমু।'

বিদায় নেওয়ার সময় হাসান বলে গেল সকালে গাড়ি নিয়ে হাজির থাকবে।

ওরা মা-ছেলে ফ্রেশ হতে না হতেই মাগরিবের আজান দিয়ে দিলো। তারপরই ঝুপ করে সন্ধ্যা নামল। প্রিন্সের মনে হলো বিচ্ছিন্ন এক পৃথিবীতে চলে এসেছে। এখানে বিদ্যুৎ থাকলেও সম্ভবত লোডশেডিং চলছে। আসাদুল্লাহ দুইটা হারিকেন ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

নিচে একটু দূরে মিটমিট করে কয়েকটা আলো জ্বলছে। উপরে উঠবার সময় দেখে এসেছে পাকা রাস্তাটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে গিয়ে সামান্য একটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে। একটু সামনে ওই পথের ওপর গোটা কয়েক দোকান। প্রিন্সের মনে হলো ওই দোকানগুলোর হারিকেন বা কুপির আলো দেখছে এখান থেকে।

'কী রে নিচে যাবি?'

'হুঁ। তুমি তো আমাকে এখনো ঘটনাটাই খুলে বলোনি।' প্রিন্সের কণ্ঠে অভিমান।

'আরে দুর বোকা। তোর কাছে লুকানোর কিছু আছে নাকি। নিচে নামার আগে চল কেয়ারটেকারের ঘরটা একটু দেখে আসি।'

কেয়ারটেকার বলে গিয়েছিল বাংলোর পেছনের দিকে তার ঘর। একটা সরু পায়েচলা পথ ধরে কোনাকুনি মিনিট তিন-চার হাঁটতেই ঘরটা পেয়ে গেল। টিনের দেওয়াল আর ছাউনি ঘরটার। সামনে সবজির বাগান। টিনের চালায় ও মাচার গায়ে লাউ ঝুলতে দেখল ওরা আলো-আঁধারিতে। ভেতর থেকে মেয়েকণ্ঠে পড়ার শব্দ শুনল প্রিন্স। ক্লাস নাইনের পড়া বুঝতে পারল ও।

পাশেই আলাদা একটা ঘর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল। বোঝা গেল রান্না হচ্ছে। ওদের খাবারও এখানেই রান্না হবে। লাকড়ির চুলায় রান্না করা খাবার খাবে ভেবে জিবে জল চলে এলো প্রিন্সের।

'চল ওদের বিরক্ত করব না। দেখার ছিল দেখলাম। এবার আমরা নিচে যাই। তুই একটা মিনিট দাঁড়া। আমি টর্চ নিয়ে আসছি।'

নাবিলা বাংলো থেকে বের হয়ে এলেন যখন তখন হাতে টর্চ ছাড়াও প্রিন্সের একটা জ্যাকেট। নিজেও গায়ে জড়িয়েছেন পাতলা একটা শাল।

ঠিক তখনই প্রিন্স আবিষ্কার করল কেমন শীত শীত লাগছে ওর। নভেম্বরের শুরুতে ঢাকায় শীত না থাকলেও এখানে বেশ শীত পড়তে শুরু করেছে। আর এটা টের পাওয়া যাচ্ছে সন্ধ্যা নামার পর।

'সাবধানে পা ফেলিস।' টর্চ নিয়ে সামনে থেকে বললেন নাবিলা।

তারপর আবার বললেন, 'এবার তা হলে আমাদের এখানে আসার কারণটা শোন। এই এলাকায় রহস্যময় কিছু একটা ঘটছে। প্রথমে এক লোকের দুটো গরু মেরে রেখে যায় কিছু একটা। সেটা মাসখানেক আগের ঘটনা। তারপর নিয়মিতই গরু মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। সর্বশেষ একটা লোক নিখোঁজ হয় এক সপ্তাহ আগে বাড়ি থেকে। দুই দিন পর বাংলোর পেছনের পাহাড়ের জঙ্গলে তার লাশ পাওয়া যায়। কোনো প্রাণী... বাক্যটা শেষ করার আগেই পা হড়কাল নাবিলার।

নাবিলা পুরোপুরি পড়ার আগেই পেছন থেকে প্রিন্স ধরে ফেলল ওকে। টর্চটা হাত থেকে মাটিতে মুখথুবড়ে পড়েছিল। ওটা এখন উদ্দেশ্যহীনভাবে আলোকরশ্মি ছড়াচ্ছে।

প্রিন্সের হাত ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়লেন নাবিলা।

'খুব তো আমাকে সাবধান থাকতে বলে নিজেই অঘটন ঘটালে। ভাগ্যিস ধরতে পেরেছিলাম।'

'ঠিক বলেছিস। না হলে হাড়গোড় ভাঙত নিদেনপক্ষে। আর আমাদের এবারের অভিযানের দুর্ভাগ্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটত।'

নিজেই টর্চটা তুলে নিয়ে ওটাকে মুছে নিয়ে আবার হাঁটা ধরলেন। পেছন পেছন প্রিন্স। কিছুই হয়নি এমনভাবে আগের জায়গা থেকে আবার বলা শুরু করলেন নাবিলা, 'মানে কীসে মেরেছে এটা পরিষ্কার না! তবে শরীরের ক্ষতগুলো দেখে মনে হয়েছে কোনো জানোয়ারের কাণ্ড। গলার কাছটা ভাঙা। শরীরে নখের চিহ্নও ছিল।'

'ও ভয়ংকর। আসলেই তো, কোন প্রাণী এ কাজ করল? গরুগুলোকেই বা মেরেছে কীসে?' প্রিন্সের কণ্ঠে বিস্ময়।

'এটা একটা বড়ো সমস্যা। কারণ একসময় এদিকটায় অনেক জঙ্গল ছিল। নব্বইয়ের দশকের একেবারে শুরুতে এখানে অন্য এলাকা

থেকে এসে বসত গাড়ে কিছু পরিবার। ওদের নাকি তখন চিতাবাঘের ভয়ে রাতে মশাল নিয়ে পাহারা দিতে হতো। তবে সমস্যা হলো সেই আগের পুঁটিছড়া আর নেই। এদিকটায় জঙ্গল অনেকটাই হাল্কা হয়ে গেছে। গত বিশ বছরে শিয়াল বড়োজোর বাঘডাশ ছাড়া বড়ো কোনো প্রাণী দেখেনি এখানকার মানুষ।' একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন নাবিলা।

ওরা এখন পাহাড় থেকে নেমে রাস্তাটা দিয়ে হাঁটছে। দূরে মিটমিট আলো দেখা যাচ্ছে। মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই দোকানগুলোর সামনে চলে এলো। পাশাপাশি চারটি দোকান। এর মধ্যে একটা বন্ধ। বাকি তিনটার মধ্যে একটা মুদি দোকান, একটা রেস্তোরাঁ এবং একটা চা-পান-সিগারেটের দোকান।

চায়ের দোকানটার বাইরে দুটি টুল পাতা। একটায় দুজন লোক বসে আছে। প্রিন্সকে অবাক করে দিয়ে নাবিলা অন্য টুলটায় গিয়ে বসে পড়লেন। অগত্যা সেও মায়ের পাশে বসল।

এবার মধ্যবয়স্ক দোকানদারের দিকে তাকালেন নাবিলা। প্রিন্সও চাইল। বয়স পঁয়তাল্লিশের মতো হবে। পান খেয়ে লাল দাঁত হয়েছে—দেখা যায় কথা বললেই। তবে রোগা চেহারাটার মধ্যে কেমন একটা ভালোমানুষি ভাব আছে।

একজন সুন্দরী নারী আর এক কিশোরকে দেখে খুব অবাক হয়েছে বলে মনে হলো না। মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, 'আপা চা দিমু। ভাগিনার জন্য কী দিমু?'

'কিরে চা খাবি?' প্রিন্সকে আবারও অবাক করলেন নাবিলা। কারণ সাধারণত ও চা খায় না, নাবিলাও এটা ভালোভাবেই জানেন। তবে আজ কেন যেন এই আলো-আঁধারিতে হালকা শীতের মধ্যে এক কাপ চা গলায় ঢালতে ইচ্ছা করল। তাই রাজি হয়ে গেল।

'তা আয়াজ আলী আপনার ছেলেই তো একটা কিছু দেখে ভয় পেয়েছে, তাই না?